নেপথ্য কাহিনী

সুব্রত রায়

পাঁচুগোপাল মিত্র রোডে সাত নম্বর বাড়ির দোতলায় পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতের পরিস্থিতি নিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে কমরেড বীরেন ঘোষের আলোচনা সুরু হয়েছে। নভেম্বর মাস। বিকেল তখন চারটে। লম্বা আয়তাকার টেবিলের চার পাশে সকলে আলোচনায় মগ্ন। টেবিলের মাঝ বরাবর খবরের কাগজ পাতা। তার উপর মুড়ি আর তেলেভাজা রাখা আছে। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কমরেডরা তার সদ্ব্যবহার করছে। কমরেড ঘোষ মন দিয়ে আলোচনা শুনছেন। মাঝে মাঝে চোখ বুজে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছেন। শোনার ভান করছেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। তবে থেকে থেকে দু-একটা মন্তব্য করছেন। কমরেড ঘোষ ভালো করেই জানেন যে যতই আলোচনা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তাঁর কথার পরে কেউ আর কথা বলতে পারবে না। তবে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। সবাইকে বলবার সুযোগ দিতে হবে। জেলাস্তরের কমরেডদের মতামত বিবেচনার পর পার্টি সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এ-কথা কমরেড ঘোষ সব সময় বলে থাকেন। তিনি জোর গলায় বলেন, তাঁদের পার্টি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। নেহাত আলোচনা তিন চার ঘণ্টার বেশি দীর্ঘায়ত না হলে কমরেড ঘোষ আলোচনা থামাবার চেষ্টা করেন না।

কমরেড ঘোষ তাঁর দীক্ষাগুরু কমরেড চক্রবর্তীর কথা সবসময় মনে রাখেন। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার এই রকম একটা সভার কথা তাঁর মনে আছে। সেই সভায় কমরেড চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করছিলেন। আজকের নেতা কমরেড ঘোষ সেদিন ছোকরা রাজনৈতিক কর্মী। চার ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। আলোচনা শেষ আর হয় না। বিরক্ত হয়ে কমরেড চক্রবর্তী বললেন - কমরেড, মার্ক্স ফার্ক্স তো অনেক হলো এবার কাজের কথায় আসা যাক। কমরেড ঘোষ অবশ্য এই রকম অবস্থার এখনও সম্মুখীন হন নি।

চা এসে গেছে। এই রকম মিটিং-এর জন্য ছোট ছোট কম দামি কাপ ব্যবহার হয়। দু-একটা কাপের হাতল নেই। কয়েকটা কাপের মাথার দিক অল্প ফাটা।

কমরেড ঘোষ দেখে শুনে একটা ফাটা কাপ তুলে নিলেন। আমি তোমাদের লোক। বাইরের লোকেদের সামনে তার প্রমাণ রাখতে কমরেড ঘোষ কখনও ভুল করেন না।

সাত নম্বর বাড়িতে কমরেড ঘোষের একটা সুসজ্জিত ঘর আছে। বড় একটা টেবিল। দামি চেয়ার। ফাজিল কমরেডরা বলে আর, থিটা, ফাই চেয়ার। চেয়ারের তলায় চাকা লাগানো, তাই আগু-পিছু করা যায়। চেয়ারে বসে ঘুরপাক খাওয়া যায়। আর পিঠ ব্যথা করলে পিছনে হেলান দিলে চেয়ারটা মাটির দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ে। এ ঘরে বসলে কমরেড ঘোষ দামি কাপে দার্জিলিং চা খান। ঘরের একদিকে বই-এর আলমারি। কাচের ফাঁক দিয়ে যাতে বইগুলো দেখতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা আছে। কয়েকটা তাক লেনিন আর স্টালিন গ্রন্থাবলী দিয়ে ভর্তি। একসময় বইগুলো খুব সস্তায় রাশিয়া থেকে আসতো। কলেজ স্ট্রিটে খুব অল্প দামে পাওয়া যেতো। রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর এইসব বই এর যোগান কমেছে। চেয়ারে বসে মুখ তুললে লেনিনের একটা বিরাট ছবি চোখে পড়ে। ঘরের একপাশে একটা ডেস্কটপ কম্পুটার। কম্পুটারটাতে অবশ্য কমরেড ঘোষ নিজে হাত দেন না। তাঁর একজন সেক্রেটারি আছে। এই বিকাশ ছেলেটি খুব চটপটে। সব সময় কমরেড ঘোষের সঙ্গে আঠার মতন লেগে থাকে। সে কমরেড ঘোষের নির্দেশ মতো কম্পুটার ব্যবহার করে। অনেক বছর আগে কমরেড ঘোষ কম্পুটার বিরোধী আন্দোলনে জীবন পণ করে সামিল হয়েছিলেন। তরুণ নেতা হিসাবে এল আই সির অফিসের সামনে দিনের পর দিন পিকেটিং করতে হয়েছিলো। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে কম্পুটার বসানো নিয়ে যে ধুন্ধুমার কাণ্ড হয়েছিলো তার পুরোভাগে ছিলেন কমরেড ঘোষ। কমরেড ঘোষ জানেন এই সব আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিলেন। এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন পার্টির যেদিন পূর্ণাঙ্গ আধুনিক ইতিহাস লেখা হবে, তাঁর উল্কার মতো উত্থানের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আজ সেই সব অতীতের কথা তিনি আর মনে করতে চান না। কেউ বেশি চাপাচাপি করলে জানেন যে কমরেড ভট্ট-লাইন ধরে ভুল স্বীকার করে নিলে সব অপরাধের মার্জনা পাওয়া যায়।

আজকাল টিভি চ্যানেলগুলো বড় উৎপাত করে। একটা আলপটকা মন্তব্য করে ফেললে সেটাকে বার বার দেখাতে থাকে। পাঁচ বছর আগে কি বলেছিলেন সেই ক্লিপগুলো হাজির করে অস্বস্তি বাড়িয়ে দেয়। ভালো, মন্দ, উচিত, অনুচিত এইসবের সংজ্ঞা সময়ের সঙ্গে যে পালটে যায়, তা এরা বোঝে না। মাঝে একবার ঠিক করেছিলেন টিভির সামনে আর মুখ দেখাবেন না। তারপর ভেবে দেখলেন টিভির সামনে হাত পা ছুঁড়ে বিপক্ষ দলের নেতা, নেত্রীর মুণ্ডপাত না করতে পারলে অন্য কমরেডরা তাঁকে আর নেতা বলে মানবে না। টিভি চ্যানেলের টি আর পি কমে গেলে যেমন তাদের বিজ্ঞাপনের রেট কমে যায় ঠিক তেমনি রাজনৈতিক নেতাদের মুখ টিভিতে দেখা না গেলে তাদের দরও কমতে থাকে। তাই সে সব ভাবনা থেকে এখন নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট ছক কমরেড ঘোষ অনুসরণ করেন। নিজের দলের লোকেরা যখন গোলমালে জড়িয়ে পড়ে তখন বলেন খবরের কাগজ পড়ে আমি বিবৃতি দিই না। আগে খোঁজখবর নিয়ে দেখি, পরে বিবৃতি দেব। কিন্তু বিপক্ষ দল গোলমাল করলে সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের ডেকে গরম গরম কথা বলে থাকেন। সুবিধামতো রাজনৈতিক বিষয়ে ভবিষ্যতবাণী করে থাকেন। আবার মাঝে মাঝে বিপাকে পড়লে বলে থাকেন, আমি কি জ্যোতিষী যে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারবো।

জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লব দরজায় কড়া নাড়ছে দেখে কমরেড ঘোষ আর বেশিদূর পড়াশুনা করতে পারেননি। নিজের বাড়ি ছেড়ে দলের কমিউনে থাকতে সুরু করেছিলেন। তাও প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেলো। আজকাল অবশ্য দলে অনেক কমরেড এসেছে যারা "অ্যালজেব্রায় হাত দিয়াই দেশের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে"। অর্থাৎ ক্লাস সেভেনের পর তাদের লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে।

কমরেড ঘোষ ইংরাজিটা তেমন করে রপ্ত করতে পারেন নি। মাঝে মাঝে দু-একটা বাক্য ইংরাজিতে বলার চেষ্টা করেন। তার অর্থ আন্দাজ করে বুঝে নিতে হয়। দিল্লির কমরেডরা এ ঝামেলা এড়ানোর জন্য বাংলা শিখে নিয়েছেন। নাহলে ভাব আদানপ্রদান করতে বড্ড অসুবিধা হয়।

দীক্ষাগুরু তাকে বলেছিলেন, কিছু শব্দ যেমন গণতন্ত্র, জনগণ, সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল, বিশ্বায়ন, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারলে বড় নেতা হওয়া যায়। লোকে তাঁর বক্তৃতা শোনে। তিনি একটা ছোট পুস্তিকা রচনা করে তাতে এই রকম একশো শব্দ আর প্রতিটা শব্দ দিয়ে কুড়িটা করে বাক্য সমস্ত কমরেডদের অবশ্য পাঠ্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পুস্তিকা পড়ার ব্যাপারে তেমন কেউ আগ্রহ দেখায়নি।

আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে। কমরেড ঘোষ একটা বড় সাইজের তেলেভাজায় সবে কামড় দিয়েছেন এমন সময় বিকাশ ফোনের রিসিভারটা নিয়ে এসে বললো, বীরেনদা ফোন। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে বিদেশ থেকে এসেছে।

- হ্যালো ..
- ইজ দিস মিস্টার ঘোষ?
- ইয়েস, ঘোষ স্পিকিং ..
- আই অ্যাম লাদেন ..
- লাদেন, মানে বিন লাদেন .. হাউ সাংঘাতিক ..

কমরেড ঘোষ ফোনের রিসিভারটা কানে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

- মিস্টার ঘোষ, আপনি বাংলায় কথা বলতে পারেন। আমি বাংলা বুঝতে আর বলতে পারি।
- কি আশ্চর্য! আপনি বাংলা শিখলেন কি করে?
- এক সময় আমি সৌদি আরবে কন্ট্রাক্টরি করতাম। আমার অফিসে তিন জন বাঙালী এঞ্জিনিয়ার ছিলো। যদিও তারা কেউ কলকাতার ছেলে নয়। একজন দিল্লীর, একজন এলাহাবাদের ও আর একজন কানপুরের।
- এদের কাছ থেকে বাংলা শিখে নিলেন?
- আরে শুনুন না। এদের বউরা সবাই কলকাতার মেয়ে। খুব ভালো গান করতো। আর যা রান্না করতো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মাঝে মাঝে আমাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াত। পাঁচ বছর আমরা একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতে বাংলা শিখে ফেললাম। তবে বাংলা পড়তে পারি না।
- বুঝলাম। বলুন কেন ফোন করছেন? আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

- আমি জানি আপনি জনগণের খুব কাছের মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় আছেন। তাই আমি বাঙালীদের আচার ব্যবহারের ব্যাপারে আপনার কাছে একটু খোঁজ খবর করছি।
- মানে? ঠিক বুঝলাম না।
- মানে আর কিছুই নয়। বাঙালীরা কি পছন্দ করে, কি করে না, কি ভাবে সময় কাটায়, কি পারে, কি পারে না এই তথ্যগুলো আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।
- ও এই কথা। বাঙালীরা সবাই রাজনীতি ভালো বোঝে। অফিসে অনেকটা সময় রাজনীতি আলোচনা করে কাটায়। প্রধান মন্ত্রীর কি বিবৃতি দেওয়া উচিত অথবা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কোন দেশে যুদ্ধ বিমান পাঠাবেন এ ব্যাপারে যুক্তিপূর্ণ স্পষ্ট মতামত দিতে পারে।
- বুঝলাম। আর?
- তারপর ধরুন ক্রিকেট খেলা। কোন পিচে বল কেমন ঘুরবে, অথবা পিচের বাউন্স কতো, টিভির স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারে। ক্যাপ্টেন কাকে দিয়ে বল করাবে এ ব্যাপারে যে কোনো বাঙালীর সঙ্গে সে পরামর্শ করতে পারে।
- আর?
- বাঙালীরা খেতে খুব ভালোবাসে। যা রোজগার করে তার বেশ অনেকটাই খেয়ে উড়িয়ে দেয়।
- আর?
- মধ্যবিত্ত বাঙালীরা ছুটি পেলেই দেশ ভ্রমণে যায়। কেউ কাছে। কেউ দূরে। যার যেমন রেস্তো।
- আর?
- চিকিৎসার ব্যাপারে এদের জ্ঞান অসীম। আপনি বলুন বুকটা ধড়ফড় করছে, আপনাকে কি করা উচিত, আর কি করা উচিত নয়, বুঝিয়ে দেবে। এমনকি দু-পাঁচটা ওষুধের নামও বলে দেবে। আর তাতেও যদি আপনার শান্তি না হয় তাহলে গোটা দু-তিন ডাক্তারের নাম ফোন নাম্বার শুদ্ধ বলে দেবে।
- আর?
- বাঙালী তরুণ এবং বৃদ্ধরা রকে বসে আড্ডা দিতে খুব ভালবাসে।
- আর?

- মহিলাদের একটা বড় অংশ টিভি সিরিয়াল দেখতে খুব পছন্দ করে। সিরিয়াল চলার সময় বাড়িতে লোক এলে বা ফোন এলে ভীষণ বিরক্ত হয়।

- আর?

- এখনকার মা বাবারা বাচ্চা জন্মাবার পরদিন থেকে বাচ্চা জয়েন্টে কোন কোচিং-এ পড়বে তা ঠিক করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

- আর?

- আর একটা খুব দরকারি কথা। বাঙালীরা কোনোদিন ঠিক সময়ে অফিসে যায় না।

- কি বললেন?

- হ্যাঁ। ঠিক তাই। অফিস নটায় হলে দশটায় যাবে। দশটা হলে এগারোটায় যাবে, এটা বাঙালীদের মজ্জাগত।

- বাস বাস বুঝে নিয়েছি। আর কিছু দরকার নেই। আমার কাজ হয়ে গেছে।

- আপনি কেন এসব জানতে চাইছেন?

- আমি বাঙালীদের খুব পছন্দ করি। ওদের জন্য আমার একটা সফট্ কর্নার আছে। বাঙালীদের ক্ষতি হোক আমি চাই না।

- কি ক্ষতি? কিসের ক্ষতি?

- আহা! একটু সবুর করুন না।

লাইন কেটে গেল। কমরেড ঘোষ গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম? বিকাশকে ডেকে বললেন, ওদের বলো সব কথা আমার শোনা হয়ে গেছে। পার্টির সিদ্ধান্ত পরে জানিয়ে হবে। কারুর যদি বাড়ি ফিরতে অসুবিধা থাকে তাহলে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিও।

*　　　　*　　　　*　　　　*　　　　*

দু-দিন পরের কথা। রয়টার জানাচ্ছে উগ্রপন্থীরা বিমান হাইজ্যাক করে নিয়ে নিউইয়র্ক-এর টুইন টাওয়ারে ধাক্কা মেরেছে। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ দুটি টাওয়ারই ভেঙে পড়েছে। বহু মানুষ নিহত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। নিউইয়র্ক-এর মেয়র জানিয়েছেন যে তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে উদ্ধারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

*   *   *   *   *

আরো চারদিন পরের খবর। রয়টারকে উদ্ধৃত করে পিটিআই জানাচ্ছে ধ্বংস স্তূপ সরানো হয়েছে। বেশ কিছু মানুষকে ধ্বংস স্তূপের মধ্যে থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তবে বিস্ময়কর ভাবে মাত্র একজন বাঙালী মারা গেছে। যদিও ঐ বাড়ি দুটিতে আইটি ও অন্যান্য কাজে বহু বাঙালী নিযুক্ত ছিলো। অনুমান করা হচ্ছে অভ্যাস মতো সকাল আটটার সময় কোনো বাঙালী অফিসে এসে পৌঁছাতে পারেনি।

March 2011